দৈনিক সংবাদ

• ০০-176

তারিখ 04 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

২০শে ফাল্গুন ১৩৯৪

04 MAR 1988

# চোখ বুজে কোকিলের দিকে ফেরাবো কান

অনিরুদ্ধ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী 'সংবাদ'-এ 'অভিভাবক ফোরাম' এই শিরোনামে মোঃ আবুল হোসেনের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন অভিভাবক হিসেবে এ চিঠিটি লিখেছেন। প্রথমে তিনি যখন এ চিঠি সংবাদ-এ প্রকাশের জন্য পাঠান, তখন চিঠিপত্র কলামে এক সংক্ষিপ্ত জবাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এ চিঠি ছাপানো সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ছাত্ররা রাজনীতি করবে না, এরকম-ভাবনা-চিন্তা সঠিক নয়। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার ওই চিঠিটি পাঠান তখন আর একটু বিস্তারিতভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এবং বলা হয়, রাজনীতি অস্ত্রমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার থাকবে না। এমন তো হতে পারে না। আরও কিছু যুক্তি দেয়া হয়েছিল। তারপর তৃতীয়বার তিনি তার প্রতি প্রদত্ত জবাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আবারও চিঠিটি প্রকাশের অনুরোধ জানান। অবশ্য এবারেও তিনি মূল চিঠিটি অনুরোধপত্রের সাথে পাঠিয়ে দেন। এই হল তার চিঠিটি প্রকাশের পিছনের ইতিকথা।

পাঠক হয়তো ভাববেন এত দীর্ঘ ভনিতার প্রয়োজন কি? কারণ চিঠিপত্র কলামে তো উল্লেখই থাকে যে, "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন" অর্থাৎ প্রকাশিত পত্রের অন্তর্গত মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের কোন সম্পর্ক নেই। নেহাৎ পত্রলেখকের নিজস্ব মত এখানে স্থান পাচ্ছে। তাহলে এতসব কথার দরকার কি? যে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়বস্তুর তা চিঠি হোক, খবর হোক, খবর সম্পর্কে কারও ধ্যান ধারণা ও বক্তব্য আসুক, তার একটা দায় অন্তত: সম্পাদক সাহেবকে বহন করতে হয়। তা হল প্রকাশিত বিষয়বস্তু জনমত শুধু প্রতিফলিত করে না। তা জনমতকে প্রভাবিতও করে।

কোন বক্তব্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে যেতে পারে, পারে মানবতার বিরুদ্ধে যাতে। কেউ যদি এমন কোন লেখা পাঠান যা বর্ণবাদ-এর সপক্ষে যুক্তি বহন করে অর্থাৎ মানুষের মৌলিক মূল্যবোধ-এর বিরুদ্ধে হয়, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ বা ঘৃণার উস্কানি দেয়। তা প্রকাশ করার ব্যাপারে অবশ্যই আপত্তি থাকবে। জনমত প্রতিফলনের দোহাই দিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী কিছু ছাপানো নীতি সম্মত নয়। আবার এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে, যা দেশের প্রচলিত আইন কানুন বা কোন সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কড়াকড়ির জন্য ছাপানো সম্ভব নয়। কারণ, প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই প্রকাশক ও সম্পাদকের উপর বর্তায়।

এখানে আইনগত প্রশ্নটি অবশ্যই স্বতন্ত্র। সবদেশে এবং সর্বক্ষেত্রে তার বিচার ও মূল্যায়ন এবং দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়।

কিন্তু এছাড়া আছে সাধারণভাবে গৃহীত এবং প্রচলিত আরও কিছু মূল্যবোধ। এই চিঠিতে এরকম কিছু বিষয় রয়েছে যার আলোচনা প্রয়োজন পড়ে। আবার একজন অভিভাবকের উৎকন্ঠিত চিত্তের বহিঃপ্রকাশও এ চিঠিতে রয়েছে। ছেলেকে অথবা মেয়েকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠানো হয়, সেখানে অস্ত্রের ঝনঝনানি, বোমাবাজি হলে যেমন শিক্ষায়–শিকায় ওঠে, জান প্রাণ নিয়েও টানাটানি হয় এবং নিরপরাধ ছাত্রছাত্রীরাও যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনার কারণে আইন শৃংখলার পাকে জড়িয়ে অযথা হয়রানির শিকার হবে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়।

জনাব আবুল হোসেন সাহেবের চিঠির মূলসুর হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যাশিক্ষার জন্য। রাজনীতি করার জন্য নয়। যে কোন অভিভাবক তার সঙ্গে একমত হবেন। আবার পাশাপাশি এ সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে তথা ব্যাপক অর্থে শিক্ষাঙ্গন থেকে এদেশের এবং বিশ্বের আরও অনেক দেশে রাজনীতির একটা ধারা দেশের মূল রাজনৈতিক স্রোতধারাকে বেগবান করেছে। বিশেষভাবে একদা উপনিবেশ শাসিত দেশগুলোতে তরুণরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছেন। তারা বেশির ভাগই ছিলেন ছাত্র। দেশের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ আমলে ছাত্র রাজনীতি চলেছে। বাধা নিষেধ ছাত্ররাজনীতির উপরে পরাধীন আমলে প্রবল ছিল। তাসত্ত্বেও ছাত্রদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে রাজনীতির একটা শক্তি। সবক্ষেত্রে সর্বত্র তা মূল শক্তি নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনেও যে মুসলিম মধ্যবিত্তের অবদান এদেশে বেশি, তাদের একটা বড় অংশ ছিল ছাত্র। তারা নির্বাচনী প্রচার করেছে মুসলিম লীগের পক্ষে। তাদের প্রতিশ্রুতি এবং আদর্শ মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করেছে ছাত্ররা সেদিন।

আবার ভিন্ন আদর্শের ছাত্ররাও ছিল তাদের পাশাপাশি। লাঠালাঠি হয়নি এমন নয়; কিন্তু আজকের দিনের মত এরকম হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির জন্ম সেদিন হয়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ছাত্ররাজনীতি নিয়ে তর্ক উঠেছে। ক্ষমতায় নিয়ে ছাত্রদের ভূমিকা ভুলে গিয়ে তাদের বলা হয়েছিল লেখাপড়ায় মন দাও'। হ্যাঁ তারা লেখাপড়ায় মন দেওয়া নয়, বরং তারও চেয়ে বেশি শিক্ষক চাই দাবী পর্যন্ত করেছে যখন দেখেছে কোন কলেজে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আবার রাজনীতিকরা যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত সেখানে তারাই রুখে দাঁড়িয়েছে. নতুবা ভাষা আন্দোলন এমন বেগবান, গৌরবের সমাচারবাহী এবং ছাত্রদের প্রাণদানের মধ্য দিয়ে এমন ফলবান ইতিহাস জন্মদাত্রী হতে পারত না।

এই দেশে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে, আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আর তখনই সেদিন এদের মধ্যে অস্ত্রের রাজনীতি আমদানী করেছে শাসকশ্রেণী, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে মূল ধারাটি পথভ্রষ্ট হয়নি। ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলনে তারা প্রাণ দিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। তার মানে এই নয় যে, ছাত্ররা প্রতিনিয়ত রাজনীতি ক্ষেত্রে সামনের সারিতে স্থান নেবে। ইংলণ্ড বা আমেরিকাতে ছাত্র রাজনীতি আছে। মার্কিন মুল্লুকে ষাটের দশকে কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের শ্বেতাঙ্গদের সাথে পাঠ গ্রহণ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এতে এ পক্ষে ও পক্ষে অংশ নেয়। কিন্তু বৃহত্তর রাজনীতির সাথে অর্থাৎ কংগ্রেসের নির্বাচন, সিনেটের নির্বাচন ও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে তারা মুখ্য আন্দোলক নয়। তৃতীয় বিশ্বের চিত্র ভিন্ন ধরনের–ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে কারণ, তাদের মৌলিক অধিকার বারংবার বিপন্ন হয়। আবুল হোসেন সাহেব ১৯৮৩ সালের শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র এবং ছাত্রদের রাজপথে রক্তদানের কথা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন। এজন্য দায়ী কে, তা নির্ধারণ না করে শুধু ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন না হয় তার কথা বলেছেন। সেদিন রাজনীতিকরা আর যাই হোক শিক্ষানীতি সম্পর্কে নিজেরা আন্দোলন গড়ে তোলেননি। তারা সমর্থন দিয়েছেন। কেউ হয়তো বলবেন যে, তা দ্বারা তারা ফায়দা উঠাতে চেয়েছেন। আমরা যারা সচেতন তারা ছাত্রদের এভাবে ব্যবহৃত হতে দিতে পারি না। খুবই ভাল কথা। ছাত্ররা লেখা পড়া করবে; কিন্তু কী পড়বে সেটা তো রাজনীতির উর্ধ্বে নয়। এই তো বছরখানেক আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনৈক শিক্ষক ক্লাস নিলে ছাত্র শিবিরের সমর্থক ছাত্ররা তাকে গিয়ে বলল, এখানে মার্কসবাদ পড়ানো চলবে না। ব্যবস্থাপনা (ব্যবসা সংশ্লিষ্ট) ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের উপর বক্তব্য রাখার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন কী যথেষ্ট নয় একথা বোঝার পক্ষে যে, শিক্ষা এবং শিক্ষানীতি রাজনৈতিক সংশ্রববিহীন নয়। তাছাড়া, এই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যদিয়েই তো প্রশাসক, রাজনীতিবিদরা বেরিয়ে আসবেন। সুতরাং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গির হবেন, তার উপর নির্ভর করছে, ছাত্ররা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মত অবস্থা দেশে আছে কি নেই। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের মুখে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়েছে। স্বাধীনতার মূল্যবোধ নিজেরাই পদদলিত করেছেন রাজনীতিকরা। তার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পড়েছে ছাত্রদের উপর। সেদিন যদি রাজনীতিকরা আর একটু বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন তবে মোনেমী আমলের অস্ত্রের রাজনীতির ঐতিহ্য শিক্ষাঙ্গনে পুনরায় আবির্ভাবের পথ দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে পারতো।

সুতরাং দোষটা ছাত্রদের নয় রাজনীতিকদের। শিক্ষকরাও একই কারণে রাজনীতি মুক্ত নয়। শিক্ষক নিয়োগ হয় রাজনীতির ভিত্তিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। আমরা ব্যতিক্রমধর্মী নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্পী রশীদ চৌধুরীকে বিতাড়নের পিছনে কে বা কারা ছিলেন এবং ডঃ আনিসুজ্জামানের ঢাকায় ফিরে আসার ব্যাপারে কারা চক্রান্ত করেছেন, তার প্রতি চোখ ফিরিয়ে থেকে শিক্ষকদেরও রাজনীতি মুক্ত থাকার কথা বলা ঠিক নয়। দলীয় রাজনীতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গন মুক্ত রাখতে হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা চাই। শিক্ষা যে মানবিক গুণাবলীর ঠিকানা, তা মাঠে ময়দানে চড়া গলায় প্রচার করার পরিবর্তে কার্যক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন চাই। কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে চোরের মার বড় গলা। তার প্রতি চোখ ফিরিয়ে আমরা শুধু সদিচ্ছার মন্ত্র জপছি—ছাত্ররা রাজনীতির সংশ্রব শূন্য হবে। শিক্ষকরা শুধু শিক্ষা দিয়ে যাবেন; কিন্তু কী শিক্ষা দিবেন, সেই প্রশ্নটাই তো এক জ্বলন্ত রাজনীতি।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আসীন হলে, তার শিক্ষাগুরু এসেছিলেন তার কাছে। তার বড় আশা ছিল তার ছাত্র সম্রাট হয়েছেন সুতরাং আশাটা একটু বড় ছিল। সেদিন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে (সম্ভবতঃ চিঠি লিখেই) বলেছিলেন। আপনি আমার নিকট কী আশা করেন, আপনি জানতেন যে, আমি একজন সম্রাট পুত্র। আমার রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ সেদিন আপনি আমাকে কঠিন আরবী ভাষাই শিক্ষা দিয়েছেন। আমি আমার ভাইদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবো, তা কি শিখিয়েছিলেন। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমাকে কী করতে হবে তেমন শিক্ষা দিয়ে কী আমাকে সাম্রাজ্য শাসনে যোগ্য করে তুলেছিলেন। বরং তোষামোদসুলভ মানসিকতা নিয়ে আমাকে যা শিখিয়েছেন, তাতে এরকম ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন--ইউরোপ তার অংশ পর্তুগালের মতই একটা এলাকা। এজন্য যে আমি আপনাকে অভিযুক্ত করছি না এটাই আপনার যোগ্য পুরস্কার। এর চেয়ে অধিক পুরস্কার আপনি আমার নিকট আশা করতে পারেন না। বইটি আমার নিকট নেই বলে সঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারলাম না। কিন্তু মূল বক্তব্য ও ভাবার্থ উপরোক্ত ধরনের। সেদিনও যদি একজন সম্রাট মনে করে থাকেন যে, একজন ছাত্রের রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, সেই রাজতন্ত্রের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী ছিল এবং রাজনীতি যেখানে রাজ পরিবার এবং অমাত্য বর্গের মধ্যে কার্যতঃ সীমিত ছিল, সেখানে এই বিংশ শতকে সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা শিক্ষাঙ্গনে চোখে ঠুলি পরে শুধু 'পৃথিবী প্রায় গোলাকার, উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা' এ ধরনের শিক্ষার মধ্যে জ্ঞানার্জনের নামে তৃপ্ত থাকতে পারে না, বা থাকার কোন সম্ভাবনা আজকের পৃথিবী স্বীকার করে না।

তাহলে কি শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস চলবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিস্থিতির শিকার হয়ে বন বন বন্ধ থাকবে। শিক্ষা যাবে চুলোয়। অভিভাবকরা প্রাণান্ত হবে শিক্ষার খরচ যোগাতে। হানাহানিতে মারা যাবে ছাত্র। না, এই অবস্থা মানতে বলা হচ্ছে না উৎকন্ঠিত অভিভাবকদের। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী রাজনীতিকদের বিকৃত রাজনৈতিক আদর্শ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং এর পিছনে যারা সক্রিয় তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষায় কী বলবো:

'শত্রুপক্ষ যদি ছোঁড়ে কামান
চোখ বুঁজে কোন কোকিলের দিকে
ফেরাব কান,
বলবো বৎস, সভ্যতা যেন
থাকে বজায়!'

তিনি তো এভাবেই বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন তাদের যারা 'বোতাম আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান' দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছন্ন সদিচ্ছার আর্তকান্না দিয়ে স্রোতের গতি ফেরাতে চান।

কবি বিষ্ণু দে বলেছেন: স্থিতাবস্থা চেয়ে কান্না শিল্পে মহাপাপ। রাজনীতি ক্ষেত্রেও বলা চলে স্থিতাবস্থা চেয়ে কান্না জীবনাচরণেও পাপকে আবাহন করে।

ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ যে অসুস্থ বিকার চলছে কোন কোন ক্ষেত্রে, কোথাও কোন সময়, তার উৎস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তার প্রতিবিধানের কথা বলতে হবে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না। অভিভাবক জাতীয় সম্মেলনে দাঁড়িয়ে যে শিক্ষাব্রতী ছাত্রদের জন্য বছর দুয়েক আগে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেদিন কেউ তার বহুরূপী চরিত্র জেনেও কথা বলেননি। আজ সেই শিক্ষককে কেউ কি সাহস করে রাজনীতি থেকে সরে এসে শিক্ষকতার আদর্শের কথা বলতে পারবেন। না, পারবেন না। সেদিনও তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ নিয়েই অভিভাবকদের জড়ো করেছিলেন। তিনি তার সে কাজের পুরস্কার কুড়িয়েছেনও। আর অভিভাবকগণ ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে স্বাভাবিক উৎকন্ঠা বশে সদিচ্ছার কথা পুনর্ব্যক্ত করে অভিভাবক ফোরাম গঠনের কথা বলেছেন। জাতীয় অভিভাবক সম্মেলন এযাবৎ কী ফল প্রকাশ করেছে সে কথাটা অভিভাবক ফোরাম গঠনের আগে ভাবতে হবে।

দেশের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত না করে অর্থাৎ গণতন্ত্র ব্যতীত ছাত্ররাজনীতির ত্রুটি বিচ্যুতি এবং তৎপ্রসূতা কখনও কখনও বিয়োগান্ত পরিণতির পথ রুদ্ধ করা যায় না। তাই ছাত্রদের রক্তের উপর পা রেখে যখন কোন ছাত্রনেতা উপদেষ্টা বা মন্ত্রী হয়ে বসেন, কোন অভিভাবকের ধিক্কারের তর্জনী তার বিরুদ্ধে তোলা হয়েছিল কি? এ নির্মম প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে। আমরা যারা অভিভাবক হিসাবে আজ উৎকন্ঠায় ভুগছি, ততদূর এগিয়ে যেতে কি আমরা রাজী?